ঘুরে দাঁড়ানো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কথাই এখন মুখ্য

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সার্বক্ষণিক ছিলেন রাজনীতিবিদ। দেশমাতৃকা ও কিষান-কিষানী, শ্রমজীবী, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগণের উপস্থিত ভালোমন্দ আর বাংলার স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যপথে বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়েছেন

১৫ আগস্টের শোক, মাথা হেঁট হয়ে যাওয়া লজ্জা-ধিক্কার থেকে ঘুরে দাঁড়ানো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কথাই এখন মুখ্য বিষয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জীবন সংগ্রামের উপজীব্য থেকেই বাধার বিন্ধ্যাচল ডিঙিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। তিতুমীর, সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, রফিক-সালাম-জব্বার-বরকত-আসাদের শৌর্য-বীর্য, সাহস-সংগ্রাম ও জনগণের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান একুশে, উত্তাল গণঅভ্যুত্থান আর গৌরবে উজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে অসম সাহসী বিজয়ী বীর শহীদান ও আত্মত্যাগী মা-বোনদের স্মৃতি ধারণ করে গত এক যুগের আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানকে চিরায়ত শক্তিমান করতেই হবে।

অগ্নিঝরা মার্চ ১৯৭১ তারিখ ০৭। বঙ্গবন্ধুর সামনে কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। ভাবছেন : সত্তরের মাঝামাঝি 'ভুট্টো নয়, তুমিই থাকবে নির্বাচন পরবর্তী পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি'– এ টোপ গিলেই ইয়াহিয়া খান প্রথমবারের মতো 'ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট' নীতিতে নির্বাচন দিলেন। জনতার ভালোবাসায় সিক্ত ও আস্থাভাজন রাজনীতির ঝানু খেলোয়াড় বুঝতেন, ৫৬ ভাগ জনঅধ্যুষিত পূর্ববাংলার মানুষ তিনি এবং তার দলকেই জয়ী করবেন; হলোও তাই। ৩০০ জনের জাতীয় সংসদে ১৬৭ আসনের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তা ছাড়া সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত, বেলুচিস্তান থেকে কজনা এবং পাঞ্জাবের সাইয়্যিদ কাসুরি এবং পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলা) ১৬৭ জন সংসদ সদস্য মিলে বিপুল গারিষ্ঠতায় ৬ দফাভিত্তিক সংবিধান পাস হবে। ১২০০ মাইল দূরে আলাদা অর্থব্যবস্থা, স্বতন্ত্র বহির্বাণিজ্য, ভিন্ন মুদ্রা, নিজস্ব রাজস্বের পূর্ণ ব্যবহার এবং আধাসামরিক বাহিনী সংবলিত পূর্বপাকিস্তান পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে মাত্রই সামান্য দূরে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয়ে দিশাহারা ইয়াহিয়া আত্মসমর্পণ করলেন ভুট্টোর কাছে। সংসদের ঢাকা অধিবেশন স্থগিত করলেন ১ মার্চ– আগুন জ্বলে উঠল এই বাংলায়। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন ও তার হুকুমেই সব কিছু চলছে দেখে আরও কাবু হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। ভয়ে ভয়ে আবারও ডাকলেন সংসদ; তবে ষড়যন্ত্র আঁকতে থাকলেন কীভাবে গণতান্ত্রিক রায়ে জনগণের নেতা শেখ মুজিবকে ক্ষমতার বাইরে রাখা যায়। বঙ্গবন্ধুকে শায়েস্তা করার মিশনে 'অসফল' বদলির আদেশপ্রাপ্ত গভর্নর এডমিরাল আহসান ও আঞ্চলিক সেনাধ্যক্ষ সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে ধমকা-ধমকি কুমন্ত্রণা দিলেন জেনারেল পিরজাদা। জানালেন, যদি বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, তা হলে সামরিক হেলিকপ্টার থেকে বোমাবর্ষণে রেসকোর্সে জমায়েত দশ লাখ জনের প্রাণ সংহারে ও দ্বিধা করবে না শাসককুল। নামে বাঙালি হলেও ঢাকাস্থ ইয়াহিয়ার গোয়েন্দা এবং তথ্যপ্রধান বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু অবশ্যই সারাজীবনের আরাধ্য স্বাধীনতা চান; কিন্তু সেটির ঘোষণা কি ৭ মার্চ রেসকোর্সের ময়দানেই করা ঠিক হবে! কিন্তু তিনিতো বিচ্ছিন্নতাবাদীর অপবাদ নিতে চান না– বায়াফ্রার কী অবস্থা হলো, পৃথিবীর সব শক্তিই ওকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে ধিক্কার দিচ্ছে।

আওয়ামী লীগের বিশাল অংশ এবং 'ইয়ং টার্কস' ছাত্র লীগাররা ৭ মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দিতে থাকেন।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি রেসকোর্সে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিতে যাবেন। কার গাড়ি চড়ে! দাবিদার দুজন– মমিনুল হক খোকা ও গাজী গোলাম মোরশেদ। পায়চারি করছেন। পাইপে ঘন ঘন এরিনমোর জ্বালাচ্ছেন। বিকাল সাড়ে চারটায় মমিনুল হক খোকার গাড়ির দিকে পা বাড়ানোর আগে শেখ মুজিব চিরাচরিত অভ্যাস অনুসারে তার চিফ অব স্টাফ রেণুর দিকে তাকালেন। বেগম মুজিবের সাফ কথা– 'হোন, তুমি নিজের সিদ্ধান্তে আস্থা রাখো এবং মনপ্রাণ থেকে যা আসে তা-ই বলো। সেটিই সঠিক জেনে জনগণ গ্রহণ করবে।' 'ভায়েরা আমার'– যেখানে বঙ্গবন্ধু সেখানেই তার আঠারো মিনিটের স্বতঃস্ফূর্ত বজ্রকণ্ঠ এবং শতভাগ কার্যকর সেই তর্জনী ব্যবহার করে রাজনীতির শ্রেষ্ঠ কবিতাটি তাৎক্ষণিকভাবে গ্রন্থনা ও উচ্চারণ করলেন। স্বাধীনতা ঘোষণা এবং অর্থনীতির মুক্তি সংগ্রাম উচ্চারণের কিছুই বাকি রাখলেন না; আবার শাসককুলকে সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলেন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে, যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বললেন– যদি 'আমি যদি হুকুম দেবার না-ও পারি', আবার শহীদের রক্তের দাগ না শুকানো পথে সংসদে যেতে হলে যে চারটি শর্ত দিলেন– সেনাদের ব্যারাকে প্রত্যাবর্তন, সমস্ত মামলা ও হুলিয়া তুলে নেওয়া, সামরিক আইন তুলে দেওয়া এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা অর্থাৎ প্রকৃত স্বাধীনতার পথে আরও একধাপ অগ্রসর হলেন। বললেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশা আল্লাহ।'

২৫ মার্চ রাতের মধ্যপ্রহর। পাকিস্তানি দখলদারের অপারেশন সার্চলাইটে নিরস্ত্র-নিরীহ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী বাঙালির ওপর গণহত্যাহেন আক্রমণ কারার সাথে সাথেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন বঙ্গবন্ধু, বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন পাকিস্তানের সামরিক জান্তাই পাকিস্তান ভেঙে দিল– তাই তারা যেন স্বাধীন বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়। স্বামীর গোছানো ব্যাগ হাতে স্বাধীনতার 'অর্ধেক তার রেণু' বঙ্গবন্ধুর হাতে দিলেন। অন্যান্য বারের চেয়ে বেশি বিচলিত হলেন। এ জীবনে আর দেখা হবে কিনা সেই নীবর আকুতি ধারণ করে

বঙ্গবন্ধু ভালোবাসার দৃষ্টিতে রেণুর দিকে তাকালেন– 'তুমি সব কিছু দেখো, স্বাধীনতা আসবেই' মনে মনে উচ্চারণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে নিষ্ঠুর বন্দিজীবনের পথে আবারও যাত্রা শুরু করলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সার্বক্ষণিক ছিলেন রাজনীতিবিদ। দেশমাতৃকা ও কিষান-কিষানী, শ্রমজীবী, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগণের উপস্থিত ভালোমন্দ আর বাংলার স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যপথে বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়েছেন। জেল-জুলুম-অত্যাচার নিত্যসাথি আর বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব তার পরামর্শক এবং পরিবার ছাড়াও রাজনৈতিক নেতাকর্মী, সমর্থকদের ভালো-মন্দ দেখার কাজে নিয়োজিত। নিজের এবং শাশুড়ি থেকে প্রাপ্ত অর্থকড়ি দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ, চিকিৎসা, উকিলখরচ মেটানোর দায় তারই। ১৯৫৫ সালে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে ৬৭৭ নম্বর ব্লকের প্লট বরাদ্দের দরখাস্ত করালেন মুজিবভক্ত কর্মকর্তা নূরজ্জামানকে দিয়ে। মুজিবের আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আয় আর নিজস্ব তহবিল থেকে প্রাথমিক জমা দিয়ে গৃহনির্মাণ সংস্থার ঋণে নির্মাণকাজ শুরু করলেন। বাড়ি যাতে মজবুত হয় আর খরচ যাতে সাশ্রয় হয়, সেজন্য ইটে পানি ঢালাসহ কিছু কাজ নিজেই করলেন– সে বাড়িই হয়ে ওঠে বলিষ্ঠ গতিতে অগ্রসরমান বাংলাদেশের জন্মতীর্থস্থান। টুঙ্গিপাড়া কিংবা ৩২ নম্বরের বাড়ি কিংবা লন্ডনের ফ্রগনিল স্ট্রিটের দোতলায় জীবিকার দায়ে ব্রিটেনের সরকারি অফিসে কর্মরত শেখ রেহানার ফ্ল্যাট হোক, শেখদের আতিথেয়তা সর্বজনবিদিত এবং শিষ্টাচার। জাতির পিতা প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি সমীপে ৬৭৭ নম্বরে আগত অভ্যাগতদের নাশতার ট্রে গৃহপরিচারক নন, প্রায়ই শেখ রেহানা; এমনকি বঙ্গমাতাও এগিয়ে দিতেন।

রাষ্ট্রীয় কাজে দেশান্তরে যাওয়াকালে বঙ্গমাতা অনেকবারই জাতির পিতাকে 'এই পোলাডারে' অর্থাৎ আমাকে সাথে নিয়ে হোটেলে ভ্যালের জন্য নির্দিষ্ট পাশের ছোট কামরায় ঠাঁই দিতে বলতেন সার্বিক নিরাপত্তার কথা ভেবে। 'সুরক্ষিত' নবনির্মিত গণভবনে ১৯৭৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্থানান্তরে বাধা দেন বেগম মুজিব। কারণ আবদুল বা রমা বাজার থেকে এলে পণ্য কেনাকাটার দামের হিসাব থেকে মুজিব শাসনে বাজারের হালচাল এবং গাঁও-গেরামের চাষাভুষা সাধারণজন-দর্শনার্থীদের অবারিত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতেই হবে।

২৫ মার্চ একাত্তর রাত থেকে ১০ জানুয়ারি বায়াত্তর– এই নয় মাস সতেরো দিন বঙ্গবন্ধুর বিপদসংকুল কারাবাস আর বঙ্গমাতার কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। বাড়ি ভাড়া দেয় না; ছেলেমেয়ে স্কুলে ভর্তি করতে চায় না, সার্বক্ষণিক ভয়ভীতি কখন সেনারা/গোয়েন্দারা এসে ধরে নিয়ে যায়। নিত্যসাথী, ভরসার স্থল মমিনুল হক খোকা বঙ্গবন্ধুকে মিঞাভাই বলেন এবং পরমাত্মীয়। ২৭ মার্চ কারফিউ শিথিল হলেই মমিনুল হক প্রথমে ধানমন্ডির ১৫ নম্বর রোডে শেখ হাসিনাকে দেখে শেখ রেহানাকে সাথে করে তার রেণু ভাবিকে নিয়ে একটার পর একটা বাসস্থানে গেছেন। বেগম মুজিবের সকল ভাবনা, পরিবারের ভরণপোষণ, শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের চিকিৎসা, ২৭ জুলাই প্রথম সন্তান জয়ের প্রসবকালেও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাসিনার কাছে তাকে যেতে না দেওয়ার যাতনা নিয়েই বেগম মুজিবকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তারও আগে ১৭ নভেম্বর ১৯৬৭ সালে কারান্তরালে থাকা শেখ মুজিবের জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনার বিয়ে মেধাবী ওয়াজেদ আহমেদ মিয়ার সাথে পাকাপাকি করাও বেগম মুজিবকেই করতে হয়। তবে পিতা মুজিব ও কন্যা হাসিনার সম্মতিসহকারে।

পুরো নয় মাস সতেরো দিনের অবসানে ৮ জানুয়ারি '৭২ লন্ডন থেকে বঙ্গবন্ধুর সকণ্ঠে টেলিফোনের কথাবার্তাতেই বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব নিশ্চিত হন যে, পাকিস্তানি কসাইরা তাকে ফাঁসি দিতে পারেনি।

স্বাধীন বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, আশ্রয়হীনতা, শিক্ষাবঞ্চনা ও স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি মিটিয়ে মানবমর্যাদাকে সমুন্নত করে সোনার বাংলা তথা কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যৌথ সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অকৃত্রিম বন্ধু, সহধর্মিণী ও বিশ্বস্ত-দক্ষ উপদেষ্টা হিসেবে ফজিলাতুন্নেছা মুজিব রেণুর অবদানও আমাদের শিকার করতে হবে।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : সাবেক গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক